দেহশিল্পী

মনোজ আচার্য্য

লিইবার ফিয়েরা

উৎসর্গ পত্র

সকলই ফুরোবে হায়, কোনও একদিন।
আমিও ফুরিয়ে যাবো। মৃত ফসলের মতো,
শূন্য মাঠের বুক হতে, কোনও এক আসন্ন নবান্নের রাতে।

সময়ের মায়াবী মৈথুনে, ঈশ্বরের উদ্ভিন্ন শৈশব
আগামীর আলো জ্বেলে রাখে তবু প্রগতির ঔরসে।
ক্রমে ভরে ওঠে জীবনের ক্ষেত-ক্ষত আর শস্যের ঘর।

ফসল সম্ভবা মাটির বুকে মাথা রেখে
শিশিরের ঘ্রানে-ভেজা জোনাকি-আলোর সুতোয়
নব-জাগতিক নক্ষত্রের মালা বোনে এক আশ্চর্য ঈশ্বর।

সে আমায় সন্তান বলে ডাকে? না কি,
আমি তারে সন্তান বলে ডাকি? কী জানি,
ভাবিনি কখনও। হাত রেখেছি শুধু সময়ের হাতে।

প্রিয়বন্ধুবরেষু বাবা.....

ভালো থেকো।

ভূমিকা

গঠনগত দিক থেকে একটি উপন্যাস রচনাকালে তার স্তরবিন্যাস যতখানি সহজ মনে হয় তার রচয়িতার কাছে ঠিক ততখানিই কঠিন হয় বই প্রকাশের সময় তার ভূমিকা লেখার ক্ষেত্রে। আমার মতো অলেখকের জন্য তো তা যথেষ্ট বিড়ম্বনার বিষয়। তাই ভূমিকা না রাখাই মনস্থির করেছিলাম একপ্রকার। অতঃপর প্রকাশকের অনুরোধ ও তৎসহ সেইসব পাঠকদের, যাদের অক্লান্ত ভালবাসা, অনুপ্রেরণা ও সর্বোপরি প্রার্থনার গুণে এই উপন্যাস আজ প্রকাশিত হতে পারলো, তাদের জন্য অন্তত কয়েক কলম প্রাককথন থাকাটা আবশ্যক বলে মনে হলো।

সম্পূর্ণ উপন্যাসটি শেষ করতে মোট যে সময় ব্যয় হয়েছে তা দিয়ে যেকোনো প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক হাসতে হাসতে ডজন দুয়েক উপন্যাস অনায়াসে লিখে ফেলতে পারতেন। ঈশ্বর যদি আমায় তার সিকিভাগ প্রতিভাও দিতেন তবে নিশ্চিত ধন্য হতাম।

এই উপন্যাসটি যখন লেখা শুরু করেছিলাম তখন একটা তাগিদ সবসময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো আমায়,তা কিছুটা ব্যক্তিগত কারণে তো বটেই। তৎসহ বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসে একটা নতুন মাত্রা যোগ করার সদিচ্ছাও ছিল অন্তরের কোনো এক গহীন গোপন কোণে। এই উপন্যাসের মাধ্যমে সেই সদিচ্ছা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা হয়তো সময়ই বলবে।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কবিতা লেখার চেষ্টা করার সুবাদে কবিতার গঠনবিন্যাস, ব্যাকরণ, ছন্দবোধ এইসমস্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আমি যৎকিঞ্চিত স্বচ্ছন্দ হলেও এতবড়ো উপন্যাস প্রথমবারের জন্য লিখতে গিয়ে আমায় বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কাজটা যে কতটা কঠিন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি প্রতিটি পদক্ষেপে। অক্লান্ত পরিশ্রম, দীর্ঘ অধ্যাবসায় সত্ত্বেও বিস্তর ভুল ভ্রান্তি হয়তো রয়ে গেলো। আমি জানি আমার প্রিয় পাঠকেরা তা নিজগুনে ক্ষমা করবেন।

‘দেহশিল্পী’ আদ্যন্ত একটি ভিন্ন ধারার সামাজিক উপন্যাস। একই সাথে

অসমাজিকও বটে। সমাজের সবথেকে অন্ধকারময় পেশার সাথে জড়িয়ে থাকা এক নারীর উত্তরণের কাহিনী এ উপন্যাসের আশ্রয়মাত্র। তবে বিষয় নয়। এ উপন্যাসের বিষয় আদতে সেই চিরন্তন নারীসত্ত্বার আবহমান যন্ত্রনা, যা আমাদের অবচেতনে সৃষ্টির আদি হতে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এই উপন্যাস যেমন একাধারে এক শিল্পীর শিল্পের প্রতি নিষ্ঠা, তার চরম উৎকর্ষ সাধন করার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরেছে তেমনি এক অমোঘ মানবীয় সারল্যবোধ গোটা উপন্যাসটিকে ঘিরে রেখেছে পরম আদরে। তৎসহ গোটা উপন্যাসটিকে মুড়তে হয়েছে টানটান সাসপেন্স এর এক অদ্ভুত আবহে।

একটা গল্পের বহুমাত্রিক আত্মাকে তথ্য-তত্বের কুরুষকাঁটায় বুনতে হয় সযত্নে। নইলে তার বুননের ফাঁকগুলি সমাজের নগ্ন পাঁজর বড়ো অসহায়ভাবে মেলে ধরে পাঠকের সামনে। এই ধরণের ভিন্নধারার উপন্যাস লেখা তাই অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

ভিন্ন ভিন্ন আর্থ সামাজিক স্তরে থাকা ভিন্ন ভিন্ন মানব মনের জটিল মনস্তাত্বিক আবেগ, অপরাধ প্রবণতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, প্রেম-বিকার-ঈর্ষা -আত্মঅনুসন্ধান ও সর্বোপরি এক নৈসর্গিক ভালোবাসার অদ্ভুত আখ্যান মঞ্জরী এই উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রত্যেকটি চরিত্রই তাই মুখ্য চরিত্র।

ধারাবাহিক কিস্তিতে এ লেখা যখন শুরু করি, বিশ্বাস করুন ভয় ছিলো বিস্তর। বার বার মনে হতো বাস্তব আশ্রিত এতো চড়া মাত্রার এডাল্ট কন্টেন্ট যুক্ত ঘটনা বিন্যাস যা অত্যন্ত লঘু করে লিখতে গেলেও পেলব হয় না কিছুতেই, তা চক্ষুগোচর হওয়া মাত্রই না আপাত সুশীল সমাজ গেলো গেলো বলে তেড়ে এসে ছিঁড়ে খায়!

অথচ আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে প্রতি কিস্তিতে এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। পাঠক ধীরে ধীরে আর্দ্র হতে থাকেন এর বিন্যাসভঙ্গিতে, সম্পৃক্ত হতে থাকেন এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সাথে। বললে অত্যুক্তি হবে না সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপে পিঠ চাপড়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি কখনো। এমনকি এই বঙ্গের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান পর্যন্ত আপ্লুত হয়ে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। সাহিত্যের ছাত্র না হওয়ায় যে হীনমন্যতা ছিল একসময়, তাও কেটে যায় এই উপন্যাসের হাত ধরেই। আমার সকল প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের মতামত জুড়লে আরো একখানি উপন্যাস হয়ে যাবে নিশ্চিত। আর এর মাঝেই হঠাৎ করে আসতে থাকে একাধিক প্রকাশনা সংস্থা থেকে গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাবনা। তবে সর্বাগ্রে যারা এই বিজাতীয় উপন্যাসটি ছাপার অক্ষরে আরো মানুষের কাছে

পৌঁছে দেওয়ার সাহস দেখালেন, তাদের হাতেই শেষমেশ সমর্পণ করলাম এই রচনা।

একটি উপন্যাস লেখা তখনই সার্থক সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হয় যখন তার পাঠক উপন্যাসটির চরিত্রগুলিকে অবচেতনেও দীর্ঘকাল বহন করতে সক্ষম হন। বাস্তব আবহের উপর লিখিত গাঁথাও ইউটোপিয়ান হয়ে যায় অচিরেই। ছাপার অক্ষরে সাজানো চরিত্রের সাথে বাস্তব মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সাথেই সহাবস্থান করে,চরিত্রগুলোর আপাত মিল খোঁজে কাছের মানুষগুলোর মধ্যে।

'দেহশিল্পী'তে বহু দেশি ও বিদেশি ভাষাভাষী কবি-সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী এবং প্রবন্ধকারের কবিতা, লেখা এবং বইয়ের সাহায্য নিয়েছি কোনো না কোনো ভাবে। অনেক লেখকের বইয়ের সাহায্যে প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাসের আমার শোনা-জানা নানা তথ্যের অভ্রান্ততা যাচাই করে নিতে হয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এ কাজ অনেক সহজ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন অবস্থায় অনেক মানুষের ব্যক্তিগত সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়েছিলো আমার। সকলের নাম ও আনুষঙ্গিক তথ্য এখানে দিতে গেলে হয়তো প্রকাশককে আরো এক ফর্মা বাড়াতে হতো, তাতে হয়তো দামও বাড়তো বইয়ের। তাই এ থেকে নিরস্ত্র হলাম। এদের মধ্যেই এমন কিছু বিশেষ মানুষ আছেন যাদের কাছে আমার হয়তো পাহাড় প্রমান ঋণ। কিন্তু তাদের সামাজিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই তাদের নামোল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিয়ে বহুশ্রুত প্রশ্নের মূল হলো এই চরিত্র-চিত্রায়ন কি কল্পিত না বাস্তব?

এক্ষেত্রে আমার চিরাচরিত উত্তর- 'চরিত্রগুলি একইসাথে পরাবাস্তব ও কষ্টকল্পিত'। তবে সংলাপ একেবারেই কল্পিত। জানি বহু পাঠক বিস্তর রাগ করবেন আমার উপর যারা এটি জানার জন্য প্রবল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছেন। তবে আমার মতে কিছু জিনিস রহস্য বা হেঁয়ালি থাকাই শ্রেয়।

বিশেষ দুই ব্যক্তিত্বের ঋণ স্বীকার না করলে বাস্তবিক অপরাধী হয়ে থাকবো। তাদের নামোল্লেখ নীচে রইলো।

১) শ্রীমতি দেবশ্রী পাহাড়ি, সংস্কৃত অধ্যাপিকা। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ।

২) পরমস্নেহস্পদ শাশ্বতী মুন্সি।

পরিশেষে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, অত্যন্ত বিরূপ পরিস্থিতির মাঝেও আমার মা শ্রীমতি শঙ্করী আচার্য্য ও স্ত্রী শ্রীমতি মৌমিতা গাঙ্গুলীর অসীম ধৈর্য্য ও সহযোগিতা ছাড়া "দেহশিল্পী" আদৌ লেখা সম্ভব ছিলো না।

‘দেহশিল্পী’র প্রকাশক LF Books India-এর অরুণাভ বাবু ও অংশুলা ম্যাডাম এর সহযোগিতা, উৎসাহ এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণে তাদের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের এই সাহসী পদক্ষেপকে কুর্নিশ জানাই।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন, সুপ্রসন্ন কুণ্ডু মহাশয়। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ‘দেহশিল্পী’র যদি কিছুমাত্র কদর হয় তবে তা হয়তো তার প্রচ্ছদগুণেই হবে। সুপ্রসন্ন বাবুকেও সবিশেষ ধন্যবাদ।

কলকাতা
০১.০৩.২০২২

বিনত
মনোজ আচার্য্য

সোনাগাছি। এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি।

যেখানে আদিম যৌনতা নিত্য শরীর নিয়ে খেলে, ঘড়ি ধরে সুনির্দিষ্ট সময়ের বিনিময়ে। যেখানকার অসংখ্য গলি, ব্যস্ত দরজা, ঘুপচি ঘর, পলেস্তারা-খসা নোনতা দেওয়াল, আলো-আঁধারি সিঁড়ি, অশ্রাব্য কোলাহল, রং-মাখা মুখের হাসি আর মরা মাছের মতো চোখগুলো শুধু যৌনতা খুঁজে ফেরে অনুক্ষণ। আর এই যৌনতা দিয়েই এখানে বিগত কয়েক জন্মের পাপস্খালন করে নারীর যোনি থেকে জরায়ু, ওষ্ঠ থেকে কোষ্ঠ, স্তন থেকে মন।

মন???

দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা প্রাচীন শরীরী পেশায় আবার মন?

প্রশ্ন জাগতেই পারে। তবে কিনা এ পোড়া দেশে, যেখানে যৌনতার আগুন মৌনতার ছাই দিয়ে চেপে রাখতে হয়, সেখানে কে-ই বা এ প্রশ্ন করবে!

'শরীর.....! শরীর....! তোমার মন নাই কুসুম?"

❦

১২/৫, নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, বেনিয়াটোলা।

দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতির অফিস ঘরটাতে জড়োসড়োভাবে বসে বেণুদির আসার অপেক্ষা করছিল দিগন্ত।

বেণুদি এই সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই আছেন একজন সহ প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। সমাজসেবার মানেটা তাঁর কাছে একটু অন্যরকম। তাঁর মতে পতিতের ভিড়ে সহজাতভাবে না মিশলে ওদের অতীতটা জানা যায় না। আর অতীত না জানলে ওদের ভবিষ্যতটা সুস্থ সাবলীল করে তোলার যে বিরাট কর্মযজ্ঞে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন তা সফল করে তোলাও নিতান্ত দুরূহ। একদম রুটলেভেলে নেমে কাজ করেন তাই।

ওরা ওদের সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে বেণুদিকে পায় অভিভাবকের মতোই।

ভরসা করে, ভালও বাসে।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। 'ওরা' মানে সোনাগাছির আদ্যন্ত 'বেশ্যারা'। দুর্বারের খাতায় যাদের 'যৌনকর্মী' বলে উল্লেখ করা থাকলেও সমাজের তথাকথিত মূলস্রোতের মানুষজনের কাছে যাদের পরিচয় পতিতা, বারবনিতা, রেণ্ডি কিংবা আরও ভাল ভাষায় 'খানকি'। আর নিশ্চিতভাবেই বর্তমান শতকের নারীবাদের হাজারো তথ্য-তত্ত্বের আঁচে গরম হওয়া সমাজের অতি সামান্য অংশের উপরতলার নারীদের দৈনন্দিন ছক-মিলান্তি ডেটার হিসেবে খোপে আঁটে না যাদের শ্রমের হিসেব।

সহসা বেণুদি অফিসঘরে ঢুকে দিগন্তকে দেখে একগাল হেসে ফেলেন।

"কখন এলি তুই? ইসসস...অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিস না রে! কী আর করি বল, ভোটার লিস্টের কাজ আর এইডসের সচেতনতা বৃদ্ধি, দুটো কাজ সমান্তরালে চলছে। দম ফেলারও সময় পাচ্ছি না। তার মধ্যে ছুটছাট ঝামেলা তো এখানে লেগেই রয়েছে। এদের সব কথা বেণুদি-কে না বললে পেটের ভাত আবার সহজে হজম হয় না।"

"চা খেয়েছিস?"

দিগন্ত সহাস্যে মাথা নেড়ে বলে, "তোমায় অত ব্যস্ত হতে হবে না বেণুদি। আর এই অবেলায় চা খাওয়ার অভ্যেস আমার একেবারেই নেই। এবার বলো তো, আমার কাজটা কি হল?"

"হয়েছে বাবা হয়েছে। না হলে তোকে কি আর এ চুলোয় তড়িঘড়ি ডেকে আনি!"

"তবে বুঝিসই তো, ব্যাপারটা বেশ জটিল। বোঝাতে মাথার ঘাম এক্কেবারে পায়ে। তবে শেষমেশ যে কতটা বুঝিয়ে উঠতে পেরেছি তা জানি না বাবা। বিনোদকে বলতে ওই জোর দিয়ে বলল, পারলে এই মেয়েটাই পারবে। আর্টটা নাকি ও ভালই বোঝে। দুর্বারের ওসব দিকগুলো বিনোদ দেখে বলেই ওর রেফারেন্সে আস্থা রাখলাম। কুসুম, মানে মেয়েটা যদিও ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছে এককালে, আর মাথাটাও একেবারে নিরেট নয় বুঝলি দীগু। তা বোঝালাম আমার সাধ্যমতো। হাঁ করে শুনল, তারপর অবাক চোখে ঘাড় নেড়ে রাজিও হল। কতটা বুঝেছে সেটা সন্দেহের, তাই তুই নিজেই চল, সরাসরি কথা বলে নিবি।"

দিগন্তের চোখেমুখে অস্বস্তি প্রকাশ পায়।

"আবার আমি কেন বেণুদি? তুমি যখন বলছ তখন...."

"দেখ, দীগু, ট্যাবু তো তোকে এবার ছাড়তেই হবে ভাই। এরা শিল্প-ঠিল্প অত

বোঝে না। এরা টাকা বোঝে। তাও যখন শুনল তুই আমার ভাই, একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু মূল ব্যাপারটা যদি নাই বুঝতে পারে, তবে তো পুরোটাই মাটি আর ক্ষতিটা হবে তোর। সময় তো আর বেশি নেই তোর হাতে, তাই নিজে যতটা পারিস বুঝিয়ে নিয়ে শুরু করে দে চটপট। এখন চল তো, অত ভাবিস না। শিল্পীর কি ক্যানভাসে জড়তা থাকলে চলে?"

অগত্যা একরাশ অস্বস্তি নিয়ে দিগন্ত বেণুদির সাথে চললো 'কুসুম' নাম্নী জনৈকা যৌনকর্মীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে।

❀

চিৎপুরের সরকারি আর্ট কলেজের প্রতিভাবান প্রাক্তনী দিগন্ত। স্কুল অফ আর্ট ইনস্টিটিউট অফ শিকাগো আন্তর্জাতিক স্তরে, বডি আর্ট পেইন্টিং এর উপর একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে সম্প্রতি। বিজয়ী পুরস্কার মূল্যের সাথে পাবে একশো শতাংশ স্কলারশিপসহ সেখানে ভর্তির সুযোগ। এ ব্যাপারে বরাবর আগ্রহ থাকা দিগন্ত প্রতিযোগী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করে এতে। এ দেশে সেরকমভাবে এই শিল্পের বিশেষ চর্চা না থাকায়, প্র্যাকটিস মডেল নিয়ে সমস্যায় পড়ে সে। এ তো আর যে সে ব্যাপারে না, একেবারে রক্তমাংসের নিটোল জ্যান্ত ক্যানভাস চাই তার। আর্ট কলেজের পরিচিত মডেল যারা, তারা নগ্ন হয়ে গায়ে রং লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে রাজি হলেও পারিশ্রমিক হিসেবে যা চাইছে, তা দিগন্তের অত্যন্ত বেশি মনে হওয়ায় বাবার জ্যাঠতুতো দাদার মেয়ে বেণুদির শরণাপন্ন হয় সে। নিজের প্রয়োজনে আর বেণুদির আহ্বানে আজ এই প্রথমবার তার পা পড়ল, কলকাতার বিখ্যাত যৌনপীঠের গর্ভগৃহে, লোকে ভক্তিভরে যাকে 'সোনাগাছি' বলে প্রণাম করে।

❀

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের ৫ নম্বর বাড়ির বার দরজার সিঁড়িতে বসে কয়েকজন নিজেদের মধ্যে গল্পে ব্যস্ত। দিনের এই সময়টা কাস্টমারের আনাগোনা হাতেগোনা। বাড়িটা তিনতলা। বেণুদিকে দেখে একগাল হাসলেও দিগন্তের দিকে ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি সিঁড়ি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে খানিক আলো-আঁধারি পেরিয়ে কোনের ঘরটায় পৌঁছনোর আগেই দিগন্তের নজরে আসে দরজার বাইরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এক কালোপানা যুবক আর তৎসহ কানে আসে, তার হবু মডেল কুসুমের কানের রক্ত বের করে দেওয়া কুসুম-গরম বাক্যবান....

"দেখ কালুয়া, তোকে কতবার না বলেছি, এরকম খ্যাপাচোদা কাস্টমার আনবি না। দেখ, বুকের কী হাল করেছে, শালা মানুষ না কুকুর, খালি কামড়াতে চায়! ফের যদি এরকম কাস্টমার তুই এনেছিস, মাই-দিব্যি বলছি, সামনের কার্তিক পুজোর আগে তোর নীচের ও দুটো ফুচকা যদি না আমি ফাটিয়ে দিয়েছি, তবে আমার নাম কুসুমই না।"

সহসা বেণুদিকে দেখে এক হাত লম্বা জিভ কাটে মেয়েটা। দিগন্ত অবাক চোখে চেয়ে থাকে তার হবু মডেলের দিকে। অপরূপ আলোমাখা মুখখানা তার। চোখে চোখ পড়তে ইতস্তত ভঙ্গিতে চোখ সরাতে গিয়েও তা আটকে যায় ব্লাউস থেকে খানিক উন্মুক্ত সমুদ্র-সফেন বাম স্তনটির উপর। কোনও এক শ্বাপদের দাঁত বসানোর গভীর লালাভ চিহ্ন সেখানে তখনও স্পষ্ট প্রতীয়মান।

"বেণুদি এসো এসো।"

বলেই কুসুম তার অবিন্যস্ত পরিধেয় দ্রুত ঠিক করে নিতে নিতে ভিতর ঘরে ঢুকে যায়। কালুয়া তখনও হেঁটমুণ্ড দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

বেণু কালুয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে, "ভাই কালুয়া, ইমতিয়াজের দোকান থেকে তিনটে চা পাঠিয়ে দেবে? বোলো বেণুদি বলেছে, স্পেশাল চা।"

কালুয়া যেন ধরে প্রাণ পেল। একগাল হেসে ছুটল বেণুদির হুকুম তামিল করতে। তবে পরিত্রাতাকে খুশি করার দায়ও বোধকরি ছিল খানিকটা।

বেণুদির সাথে সাথে ঘরে ঢোকে দিগন্ত। ছোট ঘর, তবে বেশ গোছানো। কুসুম অতি দ্রুততায় বিছানার উপর একটা ভাল চাদর পেতে দিয়ে হাসিমুখে বেণুদিকে বলে, "বসো এখানে।" দিগন্তের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে আবার বেণুদির দিকে তাকিয়ে ফিচেল হেসে ওঠে মেয়েটা।

বেণুদি বলে, "শুধু শুধু হাসিস না তো! গা জ্বলে যায় আমার। আর ও কী ভাষা তোর? কালুয়া বেচারা তো একদম কেলিয়ে পড়েছিল।" বলে বেণুদিও হেসে ফেলে উচ্চস্বরে।

দিগন্ত খানিকটা অস্বস্তি আর ইতস্তত ভাব নিয়ে ঘরটার চারিদিক একবার চোখ ফিরিয়ে নেয় চকিতে। কোথাও কোনও বিশেষত্ব নেই। বাহুল্য বর্জিত সাদামাটা ঘুপচি ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে একটা গভীর আর্দ্রভাব যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে গোটা ঘরটাকে। জানালা বন্ধ, দিনের বেলাতেও ঘরের ভিতর টিউবলাইট জ্বলছে। মাথার উপর একটা ব্রিটিশ আমলের পাখা বিচিত্র শব্দে ঘুরে চলেছে। হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়ার থেকে শব্দ করে কানের যন্ত্রণা দেওয়াই যার মুখ্য উদ্দেশ্য। আসবাবপত্র তেমন নেই বললেই চলে। এক কোনে কয়েকটি পুরোনো ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে একাধিক ক্যালেন্ডার পেরেক থেকে